অ্যাডভোকেট গোলাম ফারুক

নারীমুক্তি আন্দোলনে নওয়াব ফয়জুন্নেসা

কয় মাস আগে ঘটা করে পালিত হল অতীশ দীপংকরের ৯২৫তম জন্মবার্ষিকী অথচ এরও পাঁচশ' বছর আগে যে জ্ঞানতাপস (পণ্ডিত শীলভদ্রের মৃত্যু ৬৫৪ খ্রি.) তৎকালীন বৌদ্ধ সমাজে এর চেয়েও বেশি সমাদৃত ছিলেন, যিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মাধ্যক্ষের (ভাইস চ্যান্সেলর) পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন, যার সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন বিশ্বখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং। এই শীলভদ্র জন্মেছিলেন কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানার কৈলান গ্রামে। জাতির কাছে এ মহান পণ্ডিতকে কেন আড়াল করে রাখা হয়েছে? ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লার কৃতী সন্তান শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তানের গণপরিষদে প্রথম বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন করেন। আজও জাতীয়ভাবে এই মহান দেশপ্রেমিককে কোন স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। এ জেলারই আর এক কৃতী সন্তান নওয়াব ফয়জুন্নেসা গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ নারীমুক্তি আন্দোলনের জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী প্রথম মুসলিম মহিলা, যিনি ব্রিটিশ রাজদরবার থেকে তার কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে নওয়াব উপাধি পান।

নওয়াব ফয়জুন্নেসার জন্ম কুমিল্লা জেলার হোসনাবাদ পরগনার লাকসামের অন্তর্গত, পশ্চিমগাঁয়ে, ১৮৩৪ সালে। তার পিতার নাম আহমেদ আলী চৌধুরী। তিনি তার পিতার প্রথম কন্যা সন্তান। ফয়জুন্নেসা শৈশবে পিতৃহীন হন। পিতার অকালমৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরেন তার মা আরফুননেছা। এ সময় তার বিয়ের অনেক প্রস্তাব আসে। মাকে অনন্যোপায় হয়ে অবশেষে গাজী চৌধুরীর হাতে মেয়েকে সঁপে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

ফয়জুন্নেসার বিয়ের পর প্রথম কয়েক বছর পারিবারিক জীবন সুখের ছিল। পরপর তার দুটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। দ্বিতীয় মেয়ের জন্মের পর থেকেই ফয়জুন্নেসার সংসার জীবনে দেখা দেয় অশনি সংকেত। গাজী চৌধুরীর উপেক্ষা শুরু হয়। এক সময় বাধ্য হয়ে তিনি স্বামীর সংসার ত্যাগ করেন এবং পশ্চিমগাঁয়ে পিত্রালয়ে চলে আসেন। পিত্রালয়েই তার জীবনের শেষ ত্রিশ বছর কাটে।

পিত্রালয়ে ফিরে আসার পর শুরু হয় তার সংগ্রাম ও সাধনার দিন। ১৮৫৫ সাল থেকে তার মায়ের জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব তুলে নিতে হয় কাঁধে। ১৮৫৫ সালে তার মাতৃবিয়োগ ঘটে। মাতৃবিয়োগের পর তিনি এক বিশাল মাতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। সাধারণত জমিদারদের জীবন হয় ভোগ ও বিলাসবহুল। কিন্তু ফয়জুন্নেসার জীবন ছিল একেবারেই সহজ ও সরল। তার জীবনে কঠোর নিয়মনিষ্ঠা ও সময়ানুবর্তিতা ছিল দেখার মতো।

নিজ জমিদারিতে প্রজাদের অবস্থা নিজ চোখে দেখার জন্য ফয়জুন্নেসা প্রায়ই পালকি বা ঘোড়ায় চড়ে বিভিন্ন মৌজায় চলে যেতেন। এলাকার উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা, অবকাঠামো নির্মাণ, মুসাফিরখানা, চিকিৎসালয়, মাদ্রাসা-মক্তব নির্মাণ প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতেন, প্রজা ও নিজস্ব এলাকার অবস্থা দেখতেন। ফলে ফয়জুন্নেসার পক্ষে খুব সহজে তার জমিদারিতে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মেহমানখানা, নওয়াববাড়ি, রাস্তাঘাট, সেবায়তন তৈরি করে গ্রামকে ছোটখাটো শহরে পরিণত করা সহজ হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে নারী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বুঝেছিলেন আধুনিক শিক্ষা না পেলে নারীরা এগিয়ে যেতে পারবে না। নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে সামাজিক ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ১৮৭৩ সালে ফয়জুন্নেসা কুমিল্লা শহরের তালপুকুর পূর্বপাড়ে পাঁচ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন 'ফয়জুন্নেসা উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়।' ঊনবিংশ শতাব্দীতে একজন মুসলিম মহিলা, মুসলিম মেয়েদের ইংরেজি এ উপমহাদেশে নারী শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন। তিনি তার জমিদারিতে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। (১) প্রাথমিক শিক্ষা, (২) পুরুষ ও মহিলার জন্য বাংলা ও ইংরেজি উভয় ধরনের শিক্ষা, (৩) ধর্মীয় শিক্ষা।

ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি 'ফয়েজিয়া মাদ্রাসা' নামে একটি অবৈতনিক মাদ্রাসা স্থাপন করেন। শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অবৈতনিক ছাত্রাবাসও তৈরি করেন। এ ছাত্রাবাসে মেধাবী ছাত্রদের জন্য আহার ও বাসস্থান ফ্রি ছিল। রাতের বেলা ছাত্রদের লেখাপড়া চালানোর জন্য জ্বালানি তেলের ব্যয়, মাসিক খোরাকি খরচ ও মৌলভী সাহেবদের সম্মানী ভাতা তিনি বহন করতেন। ফয়েজিয়া মাদ্রাসাটি ১৯৬৩ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ১৯৬৪ সালে ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিত হয়। পরে ১৯৮২ সালে জাতীয়করণ হয়ে নওয়াব ফয়জুন্নেসা কলেজ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে এটি একটি ডিগ্রি কলেজ।

শিশু অধিকার সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তাই নিজ গ্রামে শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি নওয়াব ফয়জুন্নেসা প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্কুলটি বর্তমানে পশ্চিমগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে চালু রয়েছে। ফয়জুন্নেসা তার জমিদারির ১৪টি মৌজার প্রত্যেকটিতে জমিদারি কাছারির সঙ্গে তার নিজস্ব জায়গায়, নিজ খরচে একটি করে মোট ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে প্রতিটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি করে পুকুর খনন করেন। শিক্ষা বিস্তারের যাবতীয় ব্যয়ভার তার এস্টেট থেকে বহন করা হতো। শিক্ষা বিস্তারে ফয়জুন্নেসার অবদান শুধু তার নিজ ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে তিনি একটি স্কুল স্থাপন করেন। এছাড়া মক্কা শরিফে মাদ্রাসা-ই-সওলাতিয়া ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ব্যয়ভার বহনে সহায়তা করেন।

শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও সুচিকিৎসার জন্য ১৮৯৩ সালে কুমিল্লা শহরে প্রতিষ্ঠা করেন 'ফয়জুন্নেসা জানানা হাসপাতাল'। ফয়জুন্নেসা সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি সময় পেলে সাহিত্য চর্চা করতেন। সাহিত্য অঙ্গনে ফয়জুন্নেসার প্রবেশ ১৮৭৬ সালে 'রূপজালাল' নামক একটি রূপক কাহিনী লেখার মাধ্যমে। ১৮৭৬ সালে ১০ ফেব্রুয়ারি বইটি প্রকাশিত হয়। রূপজালাল ছাড়াও সঙ্গীত সার ও 'সঙ্গীত লহরী' নামে আরও দুটি কবিতার বই তার ছিল।

এছাড়া তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সুধাকর' ও 'মুসলমান বন্ধু' পত্রিকার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ফয়জুন্নেসার জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা তার নওয়াব উপাধি লাভ। তিনি কুমিল্লার তদানীন্তন জেলা কালেক্টর মি. ডগলাসকে জেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে এক লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেন দান হিসেবে, যা তিনি আর কখনও ফেরত নেননি।

জেলা কালেক্টর মি. ডগলাসের মাধ্যমে এ মানবদরদী মহিলা জমিদারের সমাজসেবা, উদারতা ও দানশীলতার সব তথ্য ও জেলা প্রশাসকের অভিজ্ঞতা সরাসরি ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী মহারানীকে জানালে তিনি অভিভূত হয়ে তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানান এবং 'বেগম' উপাধি প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসক মি. ডগলাস জমিদার ফয়জুন্নেসাকে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর শ্রদ্ধা জানিয়ে 'বেগম' খেতাবের প্রস্তাব আনলে ফয়জুন্নেসা সরাসরি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, নিজ জমিদারিতে 'বেগম' হিসেবে তার এমনিতেই যথেষ্ট পরিচিতি আছে। সুতরাং নতুন করে 'বেগম' খেতাবের তার কোন প্রয়োজন নেই।

ফয়জুন্নেসার প্রত্যাখ্যান জেলা প্রশাসককে বিপাকে ফেলে। তিনি বিষয়টি মহারানীকে জানান। মহারানী তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ১৮৮৯ সালে ফয়জুন্নেসাকে 'নওয়াব' খেতাব দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

১৮৮৯ সালে মহারানী কর্তৃক ভারতীয়দের খেতাব তালিকায় প্রথম মুসলিম মহিলা জমিদার সম্মানিত হন 'নওয়াব' হিসেবে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তার প্রজাদের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করে গেছেন।

১৯০৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এ মহীয়সীর জীবনের অবসান ঘটে।

আস্থার সংকটে ইউনিয়ন পরিষদ

প্রলয়ংকরী বন্যায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ১৯৯৮ সালের বন্যার পর এ ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং তাতে সুফলও মিলেছিল। তখন একটি জরিপ চালিয়ে দেখা যায়, কিছু অনিয়ম-দুর্নীতি হলেও বেশির ভাগ কার্ড ভূমিহীনরা পেয়েছিল। কার্ড প্রতি যে চাল-গম বরাদ্দ হয়েছিল তার একটি অংশ 'বারো ভূতে' খেলেও এর পরিমাণ ১০-১৫ শতাংশের মধ্যেই সীমিত ছিল। ওই বন্যার পরও বিভিন্ন এলাকায় ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে খাদ্য দেয়া হয়। ২০০৪ সালের বন্যার পর ১৯৯৮ সালের চেয়েও বেশি লোককে বিনামূল্যে খাদ্য দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কারা কার্ড পাবে তার তালিকা করছেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ। কিন্তু তদারকির দায়িত্ব সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে। বিভিন্ন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তারা চেয়ারম্যান-মেম্বারদের বলছেন, কার্ড ও চাল বিতরণে অনিয়ম হলে সেনা সদস্যদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু তার আগেই অনেক এলাকায় তারা জনগণের জবাবদিহিতার মুখে পড়েছেন। একটি ইউনিয়নের ঘটনা জেনেছি এভাবে– ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক সূত্র জেনেছিল, ৫ হাজার পরিবারকে ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য দেয়া হবে। এজন্য তালিকাও চূড়ান্ত করা হয়। কারা কার্ড পাচ্ছেন সেটাও জানাজানি হয়ে যায়। তালিকা প্রণয়নে তদবির-সুপারিশ এবং রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করলেও বেশির ভাগ কার্ড প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের পাওয়ার কথা। কিন্তু অকস্মাৎ বজ্রপাতের মতোই খবর এলো– ৫ হাজার নয়, কার্ড দেয়া হবে দেড় হাজার লোককে। চেয়ারম্যান এবং মেম্বারদের পক্ষে এ নির্দেশ মহাদুর্যোগের চেয়েও ভয়ংকর। তারা কাকে রেখে কাকে বাদ দেবেন? দেশের সর্বত্রই কি এ ধরনের নির্দেশ গেছে? এমনটি হলে 'নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের' অনেককে জনরোষের মুখে এলাকা ছাড়তে হতে পারে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে ৬টি পৌরসভা এবং ৫২টি ইউনিয়ন পরিষদে জরিপ চালিয়ে দেখেছে, ত্রাণের জন্য যারা নিবন্ধিত হয়েছেন তাদের শতকরা ৭১ ভাগ স্বাভাবিক পদ্ধতিতে এ তালিকায় স্থান পেয়েছেন। আর শতকরা ২৯ জন বলেছেন, এজন্য তাদের ঘুষ দিতে হয়েছে কিংবা নিতে হয়েছে প্রভাবশালী আত্মীয়ের সাহায্য। উত্তরদাতাদের অর্ধেকের বেশি– ৫২ শতাংশ জানিয়েছেন, সরকার নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে তারা কম ত্রাণ পান। যেসব পরিবারের কোন সদস্য ভিজিডি, ভিজিএফ কিংবা টেস্ট রিলিফের জন্য নিবন্ধিত হননি তাদের এক-চতুর্থাংশের মতে, তারা এটা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। ত্রাণ বিতরণে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকায় ৭৪ শতাংশ নাগরিকই অসন্তুষ্ট।

জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয় গত বছর অক্টোবরের মাঝামাঝি। স্বাভাবিক সময়ের ত্রাণ বণ্টনের ওপর এ জরিপ পরিচালনা করা হয়। এ বছর জুলাই-আগস্টের প্রলয়ংকরী বন্যার সময় এবং পরে ত্রাণ বিতরণের ওপর জরিপ চালানো হলে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যাবে কি? সর্বগ্রাসী বন্যার কারণে ত্রাণ বিতরণের পরিমাণ এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। 'বেশি ত্রাণ-বেশি অনিয়ম'– এমনটিই কি ঘটেছে? ভিজিএফ কার্ড বিতরণের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সদস্যদের জড়িত করার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের কি হেয় করা হয়েছে? এসব প্রশ্ন স্বাভাবিক।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে জনসাধারণ বিপুল উৎসাহে অংশ নেয়। নির্বাচনের প্রার্থীদের সঙ্গে ভোটারদের নিত্যদিনের ওঠাবসা। প্রত্যেকের ব্যক্তি ও বংশ পরিচয় এবং কর্মকাণ্ড বিষয়ে তারা অবহিত। নির্বাচিতরাও তাদের ওয়ার্ড ও ইউনিয়নের বাসিন্দাদের ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। নির্বাচিত হওয়ার পর তারা কি বদলে যান? কেন প্রলয়ংকরী বন্যার পরও ভিজিএফ কার্ড এবং অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী বিতরণে তাদের ওপর এত অনাস্থা? শুধু ত্রাণ বণ্টনের ক্ষেত্রেই যে তাদের প্রতি বিশ্বাসে চিড় ধরেছে, তা নয়। গ্রামের মানুষের অভিযোগ, অনেক চেয়ারম্যান-মেম্বার বিচার-সালিশের জন্য ঘুষ নেন এবং নিরপেক্ষ থাকেন না। এমনকি নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট নেয়ার সময়েও ঘুষ দিতে হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের জরিপে দেখা যায়, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ উদাসীন। এ ধরনের অভিযোগ উঠতে থাকলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকারিতা প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই পারে।

সব চেয়ারম্যান-মেম্বার দুর্নীতি করেন, সে কথা বলা অনুচিত। কোন জরিপেই তার প্রমাণ মিলবে না। কিন্তু ভিজিএফ কার্ড বিতরণ প্রশ্নে তাদের ওপর যে পুরোপুরি আস্থা রাখা যায়নি, তার জন্য সবাইকেই এক পাল্লায় মাপা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ স্থানীয় সরকারের জন্য পৃথক (সম্পূরক) বাজেট প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন। তার যুক্তি হচ্ছে, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেটে বৈষম্য বিস্তর। স্থানীয় সরকারের মধ্যে আবার শহর ও গ্রামের বাজেটে বিস্তর বৈষম্য। অস্বচ্ছতাও আছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কান্ট্রি ডাইরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার মনে করেন, স্থানীয় সরকারের বাজেট অপ্রতুল এবং এ বিষয়ে জনমনে বিভ্রান্তিও রয়েছে। চলতি অর্থবছরের ৫৭ হাজার ২৪৮ কোটি টাকা বাজেটে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার জন্য বরাদ্দ নামমাত্র। ২২ হাজার কোটি টাকা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৯০ কোটি টাকা। পৌরসভার জন্য বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা। এ অর্থ স্থানীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয়ের সুযোগ নেই। সরকার থোক বরাদ্দ দেয় উপজেলা উন্নয়ন খাতে। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্টের একটি গবেষণার উল্লেখ করে বলেন, সরকার বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রতি বছর এক একটি ইউনিয়নে ৫ থেকে ১০ লাখ টাকা ব্যয় করে থাকে। অপরদিকে সরকার প্রতি ইউনিয়নে সরাসরি ব্যয় করে প্রায় এক কোটি টাকা। এ অর্থের ৬০ শতাংশের মতো খরচ হয় ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষকসহ অন্যান্য কর্মচারীর বেতন-ভাতা বাবদ। ৩০ শতাংশ ব্যয় হয় অবকাঠামো খাতে।

ইউনিয়ন পরিষদ দেশে সবচেয়ে পুরনো স্থানীয় সরকার কাঠামো। তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে। দাবি উঠছে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির। কিন্তু ভয়াবহ বন্যার পর হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের কার্ড সরবরাহে যাদের সততার ওপর আস্থা রাখা যায় না তাদের হাতে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ভার কী করে ছেড়ে দেয়া যাবে? এ প্রশ্নে উত্তর সর্বাগ্রে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদেরই দিতে হবে। তাদের সততা প্রশ্নবিদ্ধ। এজন্য অবশ্যই তাদের দায় রয়েছে। তারা সরকারের কথায় চলতে এবং মর্জি রাখতে গিয়ে অনিয়ম করে, এমন যুক্তি দেয়া হয়ে থাকে। দুর্নীতির দায় চাপিয়ে দেয়া হয় প্রশাসনের ওপর। বলা হয়, বরাদ্দকৃত ত্রাণের একটি অংশ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বখরা হিসেবে দেয়া হয়। সে কারণেই প্রাপকদের ভাগে পড়ে কম। এ বক্তব্য অসত্য নয়। তবে দুর্নীতির জন্য বদনাম হয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের। প্রশাসন জড়িত থাকায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সংবাদপত্র তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরছে। এতে দুর্নীতিবাজদের ওপর চাপ থাকছে। কিছু ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে। তবে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে জনসাধারণকেই। তাদের রয়েছে একটি মূল্যবান হাতিয়ার– ভোটাধিকার।